নিপীড়ক ন্যক্কার

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বময় ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর মার্শাল জোসিফ ভিসারিয়ানোভিচ স্তালিনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ‘ডি-কুলাকাইজেশন’। রুশ ভূখণ্ডকে যেনতেন প্রকারেণ কুলাকশূন্য করা। অ্যাডলফ হিটলার যখন অপমানব আখ্যায় ভূষিত করে জার্মানি থেকে ইহুদিদের তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তার অনেক আগে থেকেই কিন্তু মার্শাল স্তালিন মেতেছিলেন কুলাক বিতাড়নে। শ্রেণিতন্ত্রের দোহাই দিয়ে, বাহিরিয়া কুলাকদের নিধনযজ্ঞে হাত পাকিয়েছিলেন রুশ ইস্পাতমানব। ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিনের তথ্য অনুযায়ী, সে নরমেধে প্রাণ গিয়েছিল প্রায় এগারো লক্ষ কুলাকের।

পরিসংখ্যানের দিক থেকে কোনও ভাবেই সমতুল্য না-হলেও, তত্ত্বনীতি এবং বাস্তবিক প্রয়োগের নিরিখে অবশ্যই কুলাক বিতাড়নের সমতুল্য ঘটনাই বর্তমানে ঘটছে চিনে। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের প্রত্যন্ত জিনঝিয়াং প্রদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী উইঘুর আদিবাসীদের ওপর এখন খড়্গহস্ত ওয়েন জিয়াবাও সরকার। জিনঝিয়াং প্রদেশে সংখ্যাগুরু উইঘুররাই। তাদের বশে রাখতে নাম-কা-ওয়াস্তে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে রেখেছে বটে বেজিং। কিন্তু বাস্তবে জিনঝিয়াং চলে বেজিংয়েরই লৌহশাসনে। কারণ, কুক্ষীগত ক্ষমতা মুসলিমদের হস্তান্তর করতে আদপেই রাজি নয় চিন। সেই মুসলিমরা চৈনিক জনবসতির বহুপ্রাচীন এবং অঙ্গাঙ্গী অংশ হওয়া সত্ত্বেও। অথচ দেশের যে অংশে মুসলিমদের দাপট আদৌ প্রবল নয়, সেখানে স্বশাসন না-পেয়েও উইঘুরদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন অ-মুসলিম চিনা জনগোষ্ঠী। সঙ্গত ভাবেই, চিন সরকারের এহেন পক্ষপাতদুষ্ট নীতির বিরুদ্ধে উইঘুরদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে দীর্ঘ দিন থেকে। এখানেই বেজিংয়ের একচোখোমির নজির শেষ হলে তা-ও হয়তো ক্ষোভ প্রশমিত হত উইঘুর জনগোষ্ঠীর। কিন্তু বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো, প্রান্তিক উইঘুরদের আরও প্রান্তিক করে তোলারই কূট ষড়যন্ত্র করেছে বেজিং। ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’-র জিগির তুলে, উইঘুরদের উৎখাত করতে নয়া নীতির শরণ নিয়েছে সরকার। সরকারি সেই একুশে আইনের ফলে এখন নিজভূমেই পরবাস উইঘুরদের। সরকারি নীতি অনুযায়ী, হ্যান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চৈনিক জনতাকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে জিনঝিয়াং প্রদেশে উইঘুরদের আদি বসতে। আর এতেই বহু দিন থেকে ধিকধিক করে জ্বলতে থাকা ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছে উইঘুরদের।

বিক্ষোভের সে আগুন রক্তস্রোতে নেভানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেজিং। উইঘুরদের ‘উৎপাত’ দমনে তিতিবিরক্ত ওয়েন জিয়াবাও বিশ্বাস রেখেছেন ইংরেজি অভিধানের একটি নির্মম শব্দবন্ধে-- ক্র্যাকডাউন। কঠোর থেকে কঠোরতর নিপীড়নের রাস্তাই বেছে নিয়েছে বেজিং। নিরীহ, নিরস্ত্র আদিবাসীদের ওপর নেমে এসেছে সশস্ত্র রাষ্ট্ররোষ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার সর্বৈব ভ্রান্ত, মিথ্যা ও অমূলক অভিযোগে সাধারণ, শান্তিকামী নাগরিকদের ঠাঁই হয়েছে কারাগারে। অরাজক রাজ্যে অবাধে চলছে ধরপাকড়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে অবর্ণনীয় অত্যাচার। শান্তিকামী, নিরস্ত্র বিক্ষোভ-মিছিলের ওপর, বিনা প্ররোচনায় নির্বিচারে ছুটেছে পুলিশের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। রক্তস্নানে প্রতিবাদের মাশুল গুনেছেন উইঘুররা। নিষিদ্ধ হয়েছে নামাজ। সন্ত্রস্ত উইঘুররা প্রাণের দায়ে ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে শয়ে শয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন দেশের নানা অজ্ঞাত প্রান্তে। উইঘুর জনগোষ্ঠী হিসেবে আর নয়, বিচ্ছিন্ন, একাকী, সন্ত্রস্ত মানুষ হিসেবেই। চিনের চোখারাঙানির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না-করে, সারা বিশ্বকে এই ন্যক্কারজনক নিপীড়নের করুণ কাহিনি অবহিত করার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম।

আসলে, কমিউনিস্ট নৃশংসতার আদতটাই এমন। একবার ক্ষমতার গন্ধ পেলে তাঁরা পরিণত হন রক্তপিপাসু, মানুষখেকো বাঘে। কার্ল মার্ক্সের মহামহিম ‘ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেতারিয়াত’ তত্ত্বের যাঁরা একনিষ্ঠ ধ্বজাধারী, রাষ্ট্রক্ষমতাগর্বী তাঁরা প্রোলেতারিয়াত-এর কথা অধিকাংশ সময়েই আর মনে রাখেন না, বরং পরিণত হন ক্ষমতাদম্ভী একনায়কে। ঠিক এই ঘটনাই এখন ঘটছে তথাকথিত কমিউনিস্ট চিনে।

চিনেরও পুরনো দস্তুর অবশ্য এটাই। গত বছর বেজিং অলিম্পিকের প্রাক্কালে ঠিক এই নখদন্তময়, ভয়াবহ রূপটাই দেখিয়েছিল বেজিং। সে বার ভুক্তভোগী ছিলেন তিব্বতীরা। তাঁদের সকরুণ আর্তি বা আগুনে আত্মাহুতি, কিছুই মন টলাতে পারেনি নির্মম, নিষ্পেষক কমিউনিস্টদের। অলিম্পিকের মতো বিশ্বজনীন ক্রীড়া মহোৎসবে দেশের নাম যাতে কোনও ভাবেই ভূলুণ্ঠিত না -হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রতিবাদী তিব্বতীদের নির্মম ভাবে দমন করেছিল বেজিং। বিশ্ব-দরবারে মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে, এবারও সেই ধিক্কারযোগ্য, পরিত্যাজ্য, নিষ্ঠুর নিপীড়নের পন্থাই বেছে নিয়েছে চিন।

সমালোচনা

যে ভূমিখন্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলিন বড় বড় গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর তদুপরি আরোহণ করিয়া বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, “বলি ভায়া, ডালে আছ?”

দ্বিতীয় বানর বলিল, “আজ্ঞে, আছি।”

প্রথম বানর। আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

দ্বি, বা। কেন?

প্র, বা। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বি, বা। অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।

প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?

দ্বি, বা। না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।

প্র, বা। সেই কথাই ভাল! নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।

দ্বি, বা। বলুন। কি দোষ?

প্র, বা। প্রথম ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।

দ্বি, বা। তার পর?

প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।

দ্বি, বা। হাঁ, উহারা বাঁদুরে কথা কয় না!

প্র, বা। ঐ যে অমিতোদর বলিল, ‘ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,’ ইহা না বলিয়া যদি বলিত, ‘অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন’, তাহা হইলে সঙ্গত হইত।

দ্বি, বা। সন্দেহ কি--নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন?

প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লম্ফঝম্ফ করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।

দ্বি, বা। আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, “আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্ব-লেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি--ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই ইহা মহাপাপ।”

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, “আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি?”

আর একটি বানর কহিল, “আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।”

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্তি রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল যে, “আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।”

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *লোকরহস্য*

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গৃহীত

পুরনো বানান অপরিবর্তিত

নরম হাতে কণ্ঠরোধ

জাতীয় সুরক্ষায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হনন

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্র। বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক মতধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নির্মিত হয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সামগ্রিক ধারণা। তবে রাষ্ট্র নির্মিত কাঠামোর মধ্যে কিন্তু এই স্বাধীনতার নিয়মের প্রায়শই ব্যত্যয় ঘটে। কখনও কখনও রাষ্ট্রও নিজেকে সুরক্ষিত করতে আশ্রয় নেয় জবরদস্তির। লিখছেন **গর্গ চট্টোপাধ্যায়**

সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দেন দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অম্বিকা সোনি। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কোন্ আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন তার কয়েকটি দিক এর ফলে পরিষ্কার হয়। সেই সাক্ষাৎকারের একটি অংশের দিকে মন দেওয়া যাক।

অম্বিকা সোনি : ভগবান না করেন এমন আরেকটি ঘটনা (মুম্বইয়ের সন্ত্রাসী হামলা) না ঘটে, কিন্তু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য খবর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি হবে। একটি ছোট কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী, যার ক্ষমতা থাকবে এরকম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক খবর পাবার।

সাংবাদিক : এবং মাঝে মাঝে এও বলা যে, এই সময় সম্প্রচার বন্ধ হোক এবং এটা না-দেখানো হোক, বা সেটা আধ ঘন্টার জন্য না-বলা হোক?

অম্বিকা সোনি : যদি তেমন বলার দরকার থাকে, তাহলে বুঝলেন তো... আপনারা এটাও... আমি বলতে চাইছি এটা... একটি মত বিনিময়ের প্রক্রিয়া।

সাংবাদিক : কিন্তু তাদের কি টিভিতে প্রচার করার জন্য প্রোগ্রামগুলি বা বিভিন্ন ফুটেজ আগে থেকে দেখার অধিকার থাকবে?

অম্বিকা সোনি : ফুটেজ? সবারই টিভি দেখার সুযোগ আছে... টিভি চ্যানেল এবং খবর আসছে আর তাতে আমরা যদি তার মাঝে ছোট করে... আমি বলতে চাইছি... দয়া করে আমি যেমন করে বলছি, এটা সেই ভাবে দেখবেন (সাংবাদিক : নিশ্চয়ই)... যে এই প্রক্রিয়াটিতে আসলে উপকারই হবে... যাতে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কিছু না ঘটে যায় এবং আমরা কেউই সেটা চাই না। এবং আমরা সবাই ভেবেছি যে টিভিতে কিছু সম্প্রচার আমাদের আক্রমণকারীদেরই সাহায্য করেছিল... আমরা আপনাদের সবার ভুল শুধরে দিতে পারব... তথ্য শুধরে দেওয়া... শুধরে দেওয়া বা ছোট্ট বার্তা দেওয়া যে, এই ব্যাপারে আমাদের একটু সজাগ থাকতে হবে।

দেশের গণমাধ্যমের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব যেমন বর্তায় জাগরুক জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমের উপর, একইভাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক কিছু ক্ষমতার অধিকারী, যার ফলে এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় বা তাকে খর্ব করা যায়। তারই আলোকে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে মন্ত্রীর এই মতামত গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। জনকল্যাণ, জাতীয় স্বার্থ ও সুরক্ষার আড়ালে মোড়া এই স্বৈরাচারের দ্যোতনা থাকা কথাগুলিকে একটু তলিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই এটা বলে নেওয়া দরকার যে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাই তার শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস-- যে কারণে জনসাধারণ কোনও দলের মুখপত্রে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের খেলার খবর ছাড়া অন্য কিছুকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেন না। আইন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, জনসাধারণের মত প্রকাশের ও অবাধ গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা, জাতীয় স্বার্থ ও সুরক্ষাকেই আরও দৃঢ় করে। রাষ্ট্রও এই জাতীয় স্বার্থ ও সুরক্ষার কাজে ন্যস্ত, কিন্তু তা সংবাদমাধ্যম, বিচারবিভাগ বা জনসাধারণের স্বাধীনতাকে খর্ব করে নয়। রাষ্ট্র যখনই এমনভাবে স্বাধীনতা খর্ব করে, তা সাধারণত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ধুয়ো তুলেই করে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করা, তাও আবার মানুষের ভালোর জন্যই- এই যুক্তিটি ধোপে টেকে না। ভারতেই এমন হীন চেষ্টা করা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন ‘নব’ কংগ্রেস সরকার প্রবর্তিত জরুরি অবস্থার সময়। সেই সময়ের (কু)খ্যাত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল-এর সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা

ভারতে যে কোনও সরকার তার বৈধতা পায় ভোটের মাধ্যমে, জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশে। আবার সেই মানুষকেই ক্ষেত্র বিশেষে শিশু হিসেবে গণ্য করা-- এমন এক শিশু যে নানা মাধ্যম থেকে নানা খবর শুনে সহজেই বিভ্রান্ত। মানুষের প্রতি এই অনাস্থা আসলে সরকারের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনাস্থাকেই প্রকট করে তোলে। নানা দেশে নানা সময়ে, তা ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নই হোক, সরকার চায় সংবাদ মাধ্যমকে তার নিজস্ব বার্তাবাহকে পরিণত করতে।

আজও প্রবীণ সাংবাদিক ও সম্পাদকদের স্মৃতিতে টাটকা এবং নবীন সাংবাদিকদের তা নিয়ে জানা প্রয়োজন। এটা জানা প্রয়োজন, যে স্বাভাবিক সুস্থ সমাজে যে স্বাধীনতাগুলি প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার এবং সংবাদ মাধ্যমেরও অধিকার, তা হরণ করে নেওয়া কতটা সহজ এবং সেই স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার লড়াই কতটা কষ্টকর। আমাদের আজকের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অম্বিকা সোনি সেই সময়েই সাধারণ নাগরিক থেকে নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। সঞ্জয় গান্ধির কৃপাধন্য, আইসিএস নকুল সেনের কন্যা অম্বিকা জরুরি অবস্থায় সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হত্যার সোচ্চার সমর্থক ছিলেন।

আমরা যদি তার এই সাম্প্রতিক বক্তব্যকে খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে কপালে ভাঁজ ফেলার বেশ কিছু উপাদান-ই তাতে উপস্থিত। কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রথমত ‘বিশ্বাসযোগ্য’ খবর ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার সরকারের, এই অদ্ভুত একটি তত্ত্ব তিনি খাড়া করেছেন। তাহলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বাধীনভাবে খবর পাওয়ার ক্ষমতা আর রইল না। কারণ কোন অবস্থা আপৎকালীন, কোন খবর বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা নয়-- এ সবই ঠিক করার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হল সরকার। ভারত এই একই বিষ খেয়েছে জরুরি অবস্থার সময় এবং তখনও শোনানো হয়েছে যে এটা বিষ নয়, তেতো ওষুধ মাত্র। দ্বিতীয়ত, একটি অবাধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, বাছাই করা কিছু মানুষের ‘সঠিক উৎস’ থেকে ‘সত্য খবর’ পাবার অধিকার যে কী চরম অগণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থবিরোধী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতে যে কোনও সরকার তার বৈধতা পায় ভোটের মাধ্যমে, জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশে। আবার সেই মানুষকেই ক্ষেত্র বিশেষে শিশু হিসেবে গণ্য করা-- এমন এক শিশু যে নানা মাধ্যম থেকে নানা খবর শুনে সহজেই বিভ্রান্ত। মানুষের প্রতি এই অনাস্থা আসলে সরকারের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অনাস্থাকেই প্রকট করে তোলে। নানা দেশে নানা সময়ে, তা ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নই হোক, সরকার চায় সংবাদ মাধ্যমকে তার নিজস্ব বার্তাবাহকে পরিণত করতে। সমাজচিন্তক নোয়াম চমস্কি তাঁর বই ‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট’-এ নানা উদাহরণ দিয়ে গণতান্ত্রিক দেশে সরকার কর্তৃক মানুষকে তথাকথিত ‘সঠিক বার্তা’ দেওয়ার মহান লক্ষ্যের পর্দা ফাঁস করেছেন। অম্বিকা সোনি শুধু এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি এই মানুষকে বিভ্রান্তির হাত থেকে ‘বাঁচাতে’ এও ইঙ্গিত করেছেন যে কী সম্প্রচারিত হবে বা হবে না, তা-ও সরকারের নির্ধারণ করার অধিকার আছে। মুম্বই-এর সন্ত্রাসী হামলার মতো মর্মান্তিক ঘটনার কথা তুলে, জতীয় সুরক্ষার কথা বলে, পেছনের দরজা দিয়ে গণমাধ্যমকে বাগে আনতে চাওয়ার এই চেষ্টা ন্যক্কারজনক।

প্রসঙ্গত, এই ব্যাপারে তিনি একা নন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বারে বারে নেমে এসেছে নানা দেশে কোনও না কোনও দুঃখজনক ঘটনার হাত ধরেই। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী আক্রমণের পর সেই দেশে ‘পেট্রিয়ট অ্যাক্ট’ নামে যে আইন পাস হয় প্রায় সর্বসম্মতি ক্রমে, সেই দুর্বল মুহূর্তে, তার ফল বোঝা যায় কিছু দিনেই। সেখানে মানবাধিকার তথা গণমাধ্যমের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল সেই একই অছিলায়, জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে।

আশার কথা, সেই কালা-কানুনের নানা ধারা আদালতে বে-আইনি ও সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া সেটা সম্ভব হত না। এর থেকেই কিছুটা আন্দাজ করা যায় যে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব যেমন সরকারের, তেমনই স্বাধীন ভাবে গণমাধ্যম বা আদালতের। এখানে ‘স্বাধীন’ শব্দটি সবচেয়ে জরুরি। যখন অম্বিকা সোনি জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমকে সাহায্যের নামে সরকারের পছন্দসই বার্তা দিতে চান বা আরও ভয়ানক ভাবে, সংবাদ মাধ্যমের ‘ভুল’ শুধরে দিতে চান, তা আগামী দিনের পক্ষে এক অশনি সংকেত। ভারতের সংবাদমাধ্যমের হর্তাকর্তারাই ঠিক করবেন যে তারা স্বাধীন, বলিষ্ঠ ও দায়িত্বপূর্ণ সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী, নাকি বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁদের দায়িত্বজ্ঞান লোপ পায়-- এ-কথা মেনে নিয়ে, সরকারি মুখপত্র হতেই বেশিই আগ্রহী। উত্তর যদি হয় প্রথমটি, তাহলে তা ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে আশাপ্রদ। কিন্তু পরেরটি সত্যি হলে, কাগজ হাতে পেয়েই কেউ যদি সামনের পাতা উপেক্ষা করে সোজা চলে যায় খেলার পাতায়, তাহলে দোষ পাঠকের নয়। খেলার স্কোরে রাষ্ট্র বা সন্ত্রাসী-- কারই বা কী যায় আসে!

লেখক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক

ভারত কি একটি পুলিশ-রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে

পশ্চিমবঙ্গ ফের সংবাদ শিরোনামে। ভারতের এই রাজ্যটি যেভাবে আগেও নানা নিন্দনীয় কাজকর্মের জন্য সকলের নজর কেড়েছে, এবারও সেই একই ঘটনা। অল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড়ে সংঘাতের তীব্রতা বেড়ে গিয়েছে। যার ফলে ঘটছে জীবন ও সম্পত্তিহানির ঘটনাও। ইতিমধ্যে, মাওবাদীদের ডাকা ৪৮ ঘন্টার বন্‌ধ প্রভাব ফেলেছে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

মাওবাদী এবং নকশালপন্থী মতাদর্শে যে হিংসার কথা প্রচার করা হয়, কোনও পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে সমর্থন করা যায় না। তবু গোটা রাজ্যে মাওবাদী কার্যকলাপের প্রসার ঘটেছে, সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন বেশ কিছু গ্রামের উপর থেকে তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেলেছে। এ সমস্ত ঘটনা কার্যত একটি সূচক, যাতে রাজ্য প্রশাসনের অপদার্থতাই বেশি বেশি করে প্রকাশিত হয়। এই অপদার্থতা রাজ্যের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে, রাজ্যের অদিবাসী জনগণ এর প্রধান ফলভোগী।

ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে, দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত অঞ্চলগুলিতেই মাওবাদী এবং নকশালপন্থী কার্যকলাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অব্যাহত এবং গ্রামীণ, বিশেষত আদিবাসী জনসাধারণের জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। তিন দশকেরও বেশি সময় পশ্চিমবঙ্গে একটি শ্রমিক-দরদী বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্নীতির বিচারে ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের সঙ্গে এই রাজ্যটির বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলির জীবন ও মৌলিক অধিকারের অনিশ্চয়তা এবং প্রশাসনিক নির্লিপ্ততার কারণে ক্রমশই এঁরা সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। গ্রামীণ মানুষের এই বিচ্ছিন্নতাই মাওবাদী আন্দোলনের উর্বর ক্ষেত্র। নকশালপন্থী বা মাওবাদী অধ্যুষিত অনেক অঞ্চলে সরকারি আইনের শাসন কার্যত অনুপস্থিত। একই সঙ্গে এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এবং তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র এবং তার সহযোগীদের সন্ত্রাসের একটি প্রামাণ্য দলিল-ও বটে। এ ক্ষেত্রে সিপিএম এবং ‘সালওয়া জুডুম’ (ছত্তিশগড়ে বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি মদতে চলা নকশাল দমন অভিযান) প্রায় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সিপিএম ক্যাডাররা পায় পার্টির নেতাদের সমর্থন, অন্যদিকে ধনী এবং উচ্চবর্ণের মদত পায় সালওয়া জুড়ুম।

ছত্তিশগড়, উত্তরাঞ্চল, কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশের সরকার নকশালপন্থী সমস্যার মোকাবিলায় যে ভাবে অনবরত অন্যায় অত্যাচার চালায়, মাওবাদীদের দমনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের নীতিও একইরকম। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য রাজ্য পুলিশ জনগণের কাছ থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন যে, পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন। সরকার তাদের কোনও রকম নিরাপত্তা দিতে পারেনি। উলটো দিকে সিপিএম নেতারা দিল্লি বা কলকাতায় বসে নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে বেশি ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা বা জনাদেশ-- কোনওটাই এখন আর সিপিএম নেতাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভারতবর্ষে নকশালপন্থী বা মাওবাদী সমস্যাকে কোনও সরল ছকে বোঝা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরে জোর করে যাঁদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এখন তারাই রুখে দাঁড়িয়েছেন সেই শোষকদের বিরুদ্ধে। গরিব মানুষের এই আন্দোলন দমনে সরকারের নীতি হল ‘হিংসার বদলে হিংসা’। কিন্তু শুধু হিংসা দিয়ে যে আন্দোলন দমন করা যায় না, মণিপুর, অসম বা জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। দীর্ঘ সময় ধরে শুধু মানুষের মৃত্যু এবং বিপুল সম্পদহানি ছাড়া আর কোনও লাভ হয়নি সে সব ক্ষেত্রে। সমস্যার আখেরে কোনও সমাধান হয়নি। অথচ নকশালপন্থী বা মাওবাদী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান কিন্তু সরকারের পক্ষে অসম্ভব নয়। গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষের খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং জীবনের অধিকারকে যদি সরকার রক্ষা করতে পারে, একমাত্র তাহলেই এই ধরনের আন্দোলন বন্ধ করা সম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতবর্ষে রাজ্য বা কেন্দ্রীয়-- কোনও সরকারই এই ব্যাপারে উদ্যোগী নয়। অন্যদিকে সরকারের নীতি পর্যালোচনা করলে মনে হবে যে প্রশাসন ভারতবর্ষকে একটি পুলিশ-রাষ্ট্রে পরিণত করতেই অনেক বেশি আগ্রহী।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
২২ জুন, ২০০৯ এর বিবৃতি

(এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন তৈরি হয় ১৯৮৪ সালে, হংকং শহরে। এটি একটি অ-সরকারি সংস্থা, যার মূল কর্মসূচি এশিয়া জুড়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা)

ডাকবাক্স

উন্নয়ন বিতর্ক এবং তার সঙ্গে উঠে আসা কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

‘The instrument of labour, when it takes the form of a machine, immediately becomes a competitor of the workman himslf. The self escpansion of capital by means of machinery is thence formard directly proportional to the number of work people, whose means of livelihood have been destroyed by that machinery.'

[Karl Marx, Capital, Vol-I, Page 405]

একদিন-এর পাতায় ১ থেকে ৩ জুলাই অমিত ভাদুড়ি-মেধা পাটেকর, অধ্যাপক প্রণবকান্তি বসু এবং প্রদোষ নাথের উন্নয়ন সংক্রান্ত তিনটি লেখাই ভাবনার খোরাক যোগায়।

আমার মনে হয়েছে বৃহদায়তন আধুনিক শিল্পের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনই শুধুমাত্র বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পস্থাপন করলেই কিন্তু সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সমস্যা মিটবে না। কারণ ধনতান্ত্রিক কাঠামোর objective nature হল লাভের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য শিল্পপতি শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্র স্থাপন করা।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক কাজ করেন এবং প্রতি মাসে বেতন হিসেবে প্রত্যেকে ১০০০ টাকা পান। অর্থাৎ বেতন বাবদ মালিকের খরচ ১,০০,০০০ টাকা। এই টাকা হল ‘ভেরিয়েবল ক্যাপিটাল’। ধরা যাক, পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল বাবদ মাসিক খরচ ৫০,০০০ টাকা। এই টাকা হল ‘কনস্ট্যান্ট ক্যাপিটাল’। সুবিধার জন্য অন্যান্য খরচ স্থির ধরে নেওয়া যাক। এখন মোট ক্যাপিটাল ১,৫০,০০০ টাকার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই হল ভেরিয়েবল ক্যাপিটাল। এখন মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন কারখানার উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে তিনি লাভের পরিমাণ বাড়াবেন। এই মর্মে তিনি একটি ৫০,০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্র স্থাপন করলেন এবং ৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করলেন। এর ফলে মোট ক্যাপিটালের পরিমাণ স্থির থাকলেও, বেতন বাবদ প্রদত্ত ভেরিয়েবল ক্যাপিটাল ১,০০,০০০ টাকা থেকে কমে ৫০,০০০ টাকায় দাঁড়াল। অর্থাৎ ভেরিয়েবল ক্যাপিটাল মোট ক্যাপিটালের দুই-তৃতীয়াংশ থেকে কমে এক-তৃতীয়াংশ হল।

এখন যে ৫০ জন শ্রমিক ছাঁটাই হলেন, তারা তাদের মাসিক মোট ৫০,০০০ টাকা বেতন থেকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি কিনতেন, সেই ক্রয়ক্ষমতা তারা হারালেন। ফলে বাজারে যে ৫০,০০০ টাকা আসত, তা অদৃশ্য হল এবং যন্ত্রের মূল্যস্বরূপ কারখানার কনস্ট্যান্ট ক্যাপিটালে পরিণত হল। এদিকে শ্রমিকরা যে সমস্ত জিনিস বাজার থেকে কিনতেন, সেগুলিরও চাহিদা কমায়, এই সব পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জীবিকাও বিপন্ন হল। গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি মালিকের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির পদক্ষেপে সমাজের সাধারণ মানুষদেরই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে, অথচ এই সাধারণ মানুষের জন্যই নাকি শিল্পায়ন প্রয়োজন।

অনেকে পালটা যুক্তি দেবেন যে ৫০ জন শ্রমিক ছাঁটাই হলেও, যন্ত্র উৎপাদনের কারখানায় আবার অনেকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু কলকারখানায় শ্রমিকের বদলে যে যন্ত্র প্রতিস্থাপিত হল, তা দীর্ঘদিন সচল থাকবে। তাই যন্ত্র উৎপাদনের কারখানার কর্মীসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখতে গেলে উৎপাদিত সমস্ত যন্ত্র অন্যান্য কারখানায় শ্রমিকদের বদলে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। অর্থাৎ যন্ত্রনির্ভর কারখানায় যে পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান হল, তার বহুগুন লোকের জীবিকা এই যন্ত্রের জন্যই বিপন্ন হবে।

এর সমাধানের উপায় হিসেবে ভাবা যেতে পারে, যদি সরকার নিজে, অথবা সরকারি ও বেসরকারি পুঁজি যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন, এবং সরকার ও সমাজ যদি নজর রাখেন যাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত যন্ত্রায়ন না হয়, তাহলেই শিল্পায়ন তার প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে। মানুষের জীবিকা বিপন্ন করে যন্ত্রায়ন রুখতে প্রয়োজনে সামাজিক আন্দোলন সুফল প্রসব করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য আমাদের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষদের সহমর্মিতা।

অর্ণব পাল
হিজলি, খড়গপুর